সপ্তম অধ্যায়

কৃষি

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিনির্ভর। কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে স্থুল দেশজ উৎপাদ বা জিডিপিতে কৃষির বিভিন্ন উপখাতের (ফসল, পশুসম্পদ, বন ও মৎস্য) সমন্বিত অবদান শতকরা প্রায় ২২.৮৩ ভাগ। এতে মৎস্য খাতের অবদান শতকরা প্রায় ৫.১৫ ভাগ (সারণি ৭.২)। এককভাবে ফসল উপখাতের অবদান জিডিপি'র শতকরা প্রায় ১২.৯৪ ভাগ। দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৬২.৩ ভাগ কৃষিখাতে নিয়োজিত (বিবিএস লেবার ফোর্স সার্ভে, ১৯৯৯-২০০০)। দেশের মোট রপ্তানিতে কৃষিজাত পণ্যের (কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য ও চা সহ) অবদান শতকরা ৫.১০ ভাগ[১] (২০০২-০৩)। মূল্য সংযোজনের গুরুত্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদান ব্যাপক। দেশের আর্থ-সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র্য নিরসন ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বক্স নং ৭.১: জাতীয় কৃষি নীতি ১৯৯৯ এর প্রধান উদ্দেশ্যাবলীঃ

- লাভজনক ও টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং কৃষকের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি
- ভূমির উৎপাদনশীলতা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন
- কোন একটি ফসলের উপর অতিশয় নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনে ঝুকিঁ হ্রাস
- খাদ্য নিরাপত্তা বিধান ও পুষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি
- বিভিন্ন ফসলের বিরাজমান জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
- জৈবপ্রযুক্তির (Biotechnology) প্রবর্তন, ব্যবহার ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ
- শিল্পখাতের জন্যে সহায়ক ফসল ও অন্যান্য কৃষি পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ
- কৃষি পণ্যের আমদানি হ্রাস এবং রপ্তানি বৃদ্ধির নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি
- কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিনির্ভর নতুন শিল্প স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি
- প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও বর্গা চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization বা WTO) এর কৃষি চুক্তি, SAFTA ও অন্যান্য
- আন্তর্জাতিক চুক্তির আলোকে জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে কৃষি ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তোলা।

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

২০০২-০৩ অর্থবছরের জিডিপিতে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.২৯ শতাংশ (ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬=১০০)। এর মধ্যে শস্য উপখাতে প্রবৃদ্ধি ২.৮৮ শতাংশ, বনসম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধি ৪.৪৩ শতাংশ ও পশুসম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার ৪.৫১ শতাংশ। উক্ত অর্থবছরে মৎস্যখাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২.৩ শতাংশ। প্রাকলিত সাময়িক হিসাব অনুযায়ী বর্তমান অর্থবছরে (২০০৩-০৪) কৃষি ও মৎস্য খাতে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে যথাক্রমে ২.৪১ শতাংশ ও ৩.৬ শতাংশ। ১৯৯৩-৯৪ থেকে ২০০৩-০৪ পর্যন্ত কৃষি ও মৎস্য খাতদ্বয়ের প্রবৃদ্ধি সারণি ৭.১-এ দেখানো হল।

সারণি ৭.১ঃ কৃষি ও কৃষি উপখাত এবং মৎস্য খাতের প্রবৃদ্ধির হার

(ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬)

(শতকরা হারে)

খাত/উপ-খাত	৯৩-৯৪	৯৪-৯৫	৯৫-৯৬	৯৬-৯৭	৯৭-৯৮	৯৮-৯৯	৯৯-০০	০০-০১	০১-০২	০২-০৩	০৩-০৪ (সাময়িক)
জিডিপি প্রবৃদ্ধি	**৪.০৮**	**৪.৯৩**	**৪.৬২**	**৫.৩৯**	**৫.২৩**	**৪.৮৭**	**৫.৯৪**	**৫.২৭**	**৪.৪২**	**৫.২৬**	**৫.৫২**
১। কৃষি	- ০.৭	- ১.৯	২.০	৫.৬	১.৬	৩.২	৬.৯	৫.৫	-০.৬	৩.২৯	২.৪১
(ক) শস্য	- ১.৭	- ৩.৪	১.৭	৬.৪	১.১	৩.১	৮.১	৬.২	-২.৪	২.৮৮	১.৬৭
(খ) পশুসম্পদ	২.৪	২.৫	২.৫	২.৬	২.৬	২.৭	২.৭	২.৮	৪.৭	৪.৫১	৪.৪৮
(গ) বনসম্পদ	২.৮	২.৮	৩.৫	৪.০	৪.৫	৫.২	৪.৯	৪.৯	৪.৯	৪.৪৩	৪.৪৮
২। মৎস্যসম্পদ	৭.৯	৬.৮	৭.৪	৭.৬	৯.০	১০.০	৮.৯	-৪.৫	২.২	২.৩	৩.৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

[১] রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী।

সারণি ৭.২ ঃ জিডিপি-তে কৃষি ও মৎস্য খাতের অবদান

(ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬)

(শতকরা হারে)

খাত/উপখাত	৯৩-৯৪	৯৪-৯৫	৯৫-৯৬	৯৬-৯৭	৯৭-৯৮	৯৮-৯৯	৯৯-০০	০০-০১	০১-০২	০২-০৩	০৩-০৪ (সাময়িক)
কৃষি	**২২.২০**	**২০.৮১**	**২০.৩২**	**২০.৩৯**	**১৯.৬৭**	**১৯.৩৫**	**১৯.৪৯**	**১৯.৫১**	**১৮.৫৮**	১৮.২২	**১৭.৬৮**
শস্য	১৬.৭২	১৫.৪৩	১৫.০৩	১৫.২১	১৪.৫৯	১৪.৩৩	১৪.৫৯	১৪.৭০	১৩.৭৫	১৩.৪৩	**১২.৯৪**
	(৭৫.৩১)	(৭৪.১৭)	(৭৩.৯৬)	(৭৪.৫৭)	(৭৪.১৫)	(৭৪.০৬)	(৭৪.৮৭)	(৭৫.৩৭)	(৭৪.০)	(৭৩.৬৯)	**(৭৩.১৬)**
পশুসম্পদ	৩.৪৯	৩.৪২	৩.৩৬	৩.২৭	৩.১৯	৩.১২	৩.০২	২.৯৫	২.৯৬	২.৯৩	**২.৯০**
	(১৫.৭৫)	(১৬.৪৫)	(১৬.৫৩)	(১৬.০৬)	(১৬.২২)	(১৬.১৩)	(১৫.৫০)	(১৫.১০)	(১৫.৯)	(১৬.০৯)	**(১৬.৪২)**
বনসম্পদ	১.৯৮	১.৯৫	১.৯৩	১.৯১	১.৮৯	১.৯০	১.৮৮	১.৮৭	১.৮৮	১.৮৬	**১.৮৪**
	(৮.৯৪)	(৯.৩৮)	(৯.৫১)	(৯.৩৭)	(৯.৬৩)	(৯.৮১)	(৯.৬৩)	(৯.৫৩)	(১০.১)	(১০.২২)	**(১০.৪২)**
মৎস্যসম্পদ	**৫.১০**	**৫.২১**	**৫.৩৬**	**৫.৪৮**	**৫.৬৭**	**৫.৯৩**	**৬.০৯**	**৫.৫১**	**৫.৪০**	**৫.২৫**	**৫.১৫**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

নোটঃ বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা কৃষি খাতে উপখাতসমূহের অবদান নির্দেশ করে।

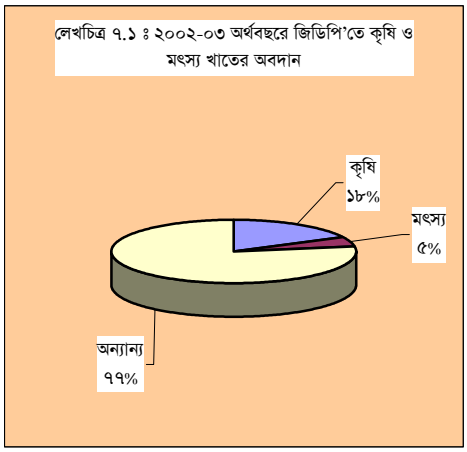

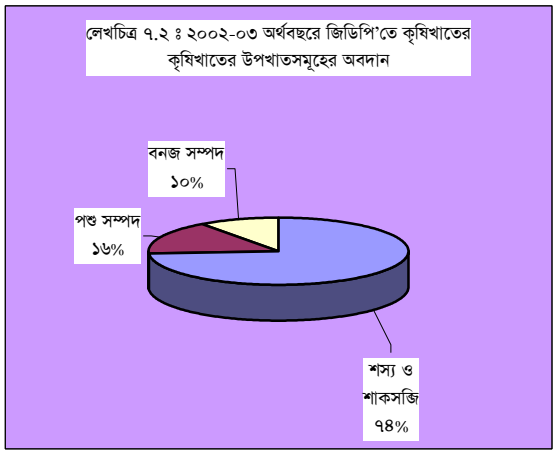

খাদ্যশস্য উৎপাদন

খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যবস্থায় গত কয়েক বছর ধরে একটি উর্ধ্বমুখী ধারা বিদ্যমান রয়েছে। পর পর কয়েক বছর ফসলের বাম্পার ফলন হওয়ায় বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করে। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে চূড়ান্ত হিসাব মোতাবেক খাদ্যশস্যের উৎপাদন দাঁড়ায় ২৬৭.০ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আউশ ১৮.৫১ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১১১.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১২২.২২ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১৫.০৭ লক্ষ মেট্রিক টন (সারণি-৭.৩)।

চলতি ২০০৩-০৪ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২৮১.২ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আউশ ১৮.৫ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১১৭.৪ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৩০.৩ লক্ষ মেট্রিক টন, ও গম ১৫.০ লক্ষ মেট্রিক টন। আউশ ও আমনের মৌসুম ইতোমধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। চূড়ান্ত হিসাব মোতাবেক আউশের উৎপাদন হয়েছে ১৮.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং আমন ফসলের উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ১১৫.২১ লক্ষ মেট্রিক টন। এ বছর গম আবাদের সময় জমিতে আর্দ্রতা বেশী থাকায় যথাসময়ে বপন করতে না পারায় গম আবাদ কম হয়েছে। আশা করা যায় গমের ফলন ১৫.০ লক্ষ মেট্রিক টন হবে। বোরো ফসলের আবাদ সম্পন্ন হয়েছে এবং বোরো ধানের আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। বোরো ফসলের বর্তমান স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান থাকলে এবং কোনরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগ না ঘটলে আশা করা যায় এ বছর বোরো ফসলের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে এবং মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন দাঁড়াবে প্রায় ২৭৩.০ লক্ষ মেট্রিক টন (সারণি-৭.৩)।

সারণি ৭.৩ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন

(১৯৯৩-৯৪ থেকে ২০০৩-০৪ পর্যন্ত)

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্য শস্য	৯৩-৯৪	৯৪-৯৫	৯৫-৯৬	৯৬-৯৭	৯৭-৯৮	৯৮-৯৯	৯৯-০০	০০-০১	০১-০২	০২-০৩	০৩-০৪ (প্রাক্কলন)
আউশ	**১৮.৫**	১৭.৯	১৬.৮	১৮.৭১	১৮.৭৫	১৬.১৭	১৭.৩৪	১৯.১৬	১৮.০৮	১৮.৫১	**১৮.৩২***
আমন	**৯৪.২**	৮৫.০	৮৭.৯	৯৫.৫২	৮৮.৫০	৭৭.৩৬	১০৩.০৬	১১২.৫০	১০৭.২৬	১১১.১৫	**১১৫.২১***
বোরো	**৬৭.৭**	৬৫.৪	৭২.২	৭৪.৬০	৮১.৩৭	১০৫.৫২	১১০.২৭	১১৯.২১	১২৭.৬৬	১২২.২২	**১২৪.৫০**
মোট চা'ল	**১৮০.৪**	**১৬৮.৩**	**১৭৬.৯**	**১৮৮.৮৩**	**১৮৮.৬২**	**১৯৯.০৫**	**২৩০.৬৭**	**২৫০.৮৭**	**২৪৩.০০**	**২৫১.৮৮**	**২৫৮.০৩**
গম	**১১.৩**	১২.৫	১৩.৭	১৪.৫৪	১৮.০২	১৯.০৮	১৮.৪০	১৬.৭০	১৬.০৬	১৫.০৭	**১৫.০**
ভূট্টা	**-**	-	-	-	-	-	-	১.৪৯	১.৫২	১.৭৫	**২.০০**
মোট (ভূট্টাসহ)	**১৯১.৭**	**১৮০.৮**	**১৯০.৬**	**২০৩.৩৭**	**২০৬.৬৪**	**২১৮.১৩**	**২৪৯.০৭**	**২৬৯.০৬**	**২৬০.৫৮**	**২৬৮.৭০**	**২৭৫.০**
মোট (ভূট্টাবাদে)	**১৯১.৭**	**১৮০.৮**	**১৯০.৬**	**২০৩.৩৭**	**২০৬.৬৪**	**২১৮.১৩**	**২৪৯.০৭**	**২৬৭.৫৭**	**২৫৯.০৬**	**২৬৬.৯৫**	**২৭৩.০**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

* cÖK…Z Drcv`b

শস্য নিবিড়তা (Cropping Intensity)

১৯৮০-৮১ সালে বাংলাদেশে মোট ভূমি এলাকা ছিল ১৪.২৯ মিলিয়ন হেক্টর, এর মধ্যে নীট চাষযোগ্য ভূমি ছিল ৯.৩৮ মিলিয়ন হেক্টর যা মোট ভূমি এলাকার মধ্যে মাত্র ৬৫.৬৫ শতাংশ। এ সময়ে শস্য নিবিড়তা ছিল ১৫৩.৬৯। ১৯৯২-৯৩ সালে দেশের মোট ভূমি এলাকা কিছু বৃদ্ধি পেয়ে ১৪.৮৪ মিলিয়ন হেক্টরে দাঁড়ায় কিন্তু নীট চাষযোগ্য ভূমি হ্রাস পেয়ে ৮.৭৫ মিলিয়ন হেক্টরে পৌঁছে যা মোট ভূমি এলাকার মাত্র ৫৮.৯৬ শতাংশ। তবে এ সময়ে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭৪.৩৫। ২০০০-০১ সালে দেশের মোট ভূমি এলাকা ছিল ১৪.৮৫ মিলিয়ন হেক্টর এবং নীট চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ ছিল ৮.৪০ মিলিয়ন হেক্টর যা মোট ভূমির মাত্র ৫৬.৫৭ শতাংশ। তবে শস্য নিবিড়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭৭.০০।

সারণি ৭.৪: বাংলাদেশে শস্য নিবিড়তার প্রবণতা

(১৯৮০-৮১ থেকে ২০০০-০১ পর্যন্ত)

(এলাকা মিলিয়ন হেক্টরে)

বৎসর	দেশের মোট ভূমি এলাকা	নীট চাষযোগ্য ভূমি	মোট এলাকার মধ্যে নীট চাষযোগ্য ভূমির শতকরা হার	নীট এলাকা দেখানো হল	মোট ফসলি এলাকা	শস্য নিবিড়তা
১৯৮০-৮১	১৪.২৯	৯.৩৮	৬৫.৬৫	৮.৫৬	১৩.১৬	১৫৩.৬৯
১৯৮১-৮২	১৪.২৯	৯.৩৮	৬৫.৬৩	৮.৫৮	১৩.২০	১৫৩.৮৪
১৯৮২-৮৩	১৪.২৯	৯.৩৬	৬৫.৬৩	৮.৬৫	১৩.০০	১৫০.৩৫
১৯৮৩-৮৪	১৪.৪৫	৯.৪৬	৬৫.৪১	৮.৬৮	১৩.৩৬	১৫৩.৯৬
১৯৮৪-৮৫	১৪.৪৮	৯.৪৩	৬৫.১০	৮.৬৪	১৩.১৫	১৫২.২২
১৯৮৫-৮৬	১৪.৪৮	৯.৪৪	৬৫.১৯	৮.৭৫	১৩.৫৪	১৫৪.৪৮
১৯৮৬-৮৭	১৪.৭০	৯.৫১	৬৪.৬৮	৮.৮৫	১৩.৩৪	১৫০.৭৩
১৯৮৭-৮৮	১৪.৮৪	৯.৮২	৬৬.২২	৮.২৯	১৩.৮২	১৬৬.৭৫
১৯৮৮-৮৯	১৪.৮৪	৯.৮৪	৬৬.৩৩	৮.১৫	১৩.৭১	১৬৮.১৯
১৯৮৯-৯০	১৪.৮৪	৯.৭৮	৬৫.৯৫	৮.৩৫	১৪.০৬	১৬৮.৪৪
১৯৯০-৯১	১৪.৮৪	৯.৭২	৬৫.৫০	৮.১৭	১৪.০৩	১৭১.৭০
১৯৯১-৯২	১৪.৮৪	৯.০৯	৬১.২৫	৭.৯৮	১৩.৮১	১৭৩.০২
১৯৯২-৯৩	১৪.৮৪	৮.৭৫	৫৮.৯৬	৭.৮৫	১৩.৭০	১৭৪.৩৫
১৯৯৩-৯৪	১৪.৮৪	৮.৭৫	৫২.০২	৭.৭২	১৩.৪৮	১৭৪.৫২
১৯৯৪-৯৫	১৪.৮৪	৮.৭৭	৫৯.১০	৭.৭৪	১৩.৫২	১৭৪.৬৪
১৯৯৫-৯৬	১৪.৮৪	৮.৭২	৫৮.৭৬	৭.৮০	১৩.৫১	১৭৩.১৮
১৯৯৬-৯৭	১৪.৮৫	৮.২৪	৫৫.৪৯	৭.৮৫	১৩.৮০	১৭৫.৭১
১৯৯৭-৯৮	১৪.৮৫	৮.৩৬	৫৬.৩০	৭.৯৭	১৪.০৯	১৭৬.৭৯
১৯৯৮-৯৯	১৪.৮৫	৮.৪৩	৫৬.৭৭	৭.৯৯	১৩.৯৬	১৭৪.৭৩
১৯৯৯-০০	১৪.৮৫	৮.৪৫	৫৬.৯০	৮.১৩	১৪.২৭	১৭৫.৫২
২০০০-০১	১৪.৮৫	৮.৪০	৫৬.৫৭	৮.০৮	১৪.৩	১৭৭.০০

উৎস: বিবিএস; সেক্টর মনিটরিং ইউনিট, কৃষি মন্ত্রণালয় মে, ২০০৩

লেখচিত্র ৭.৩: বাংলাদেশে শস্য নিবিড়তার ধারা

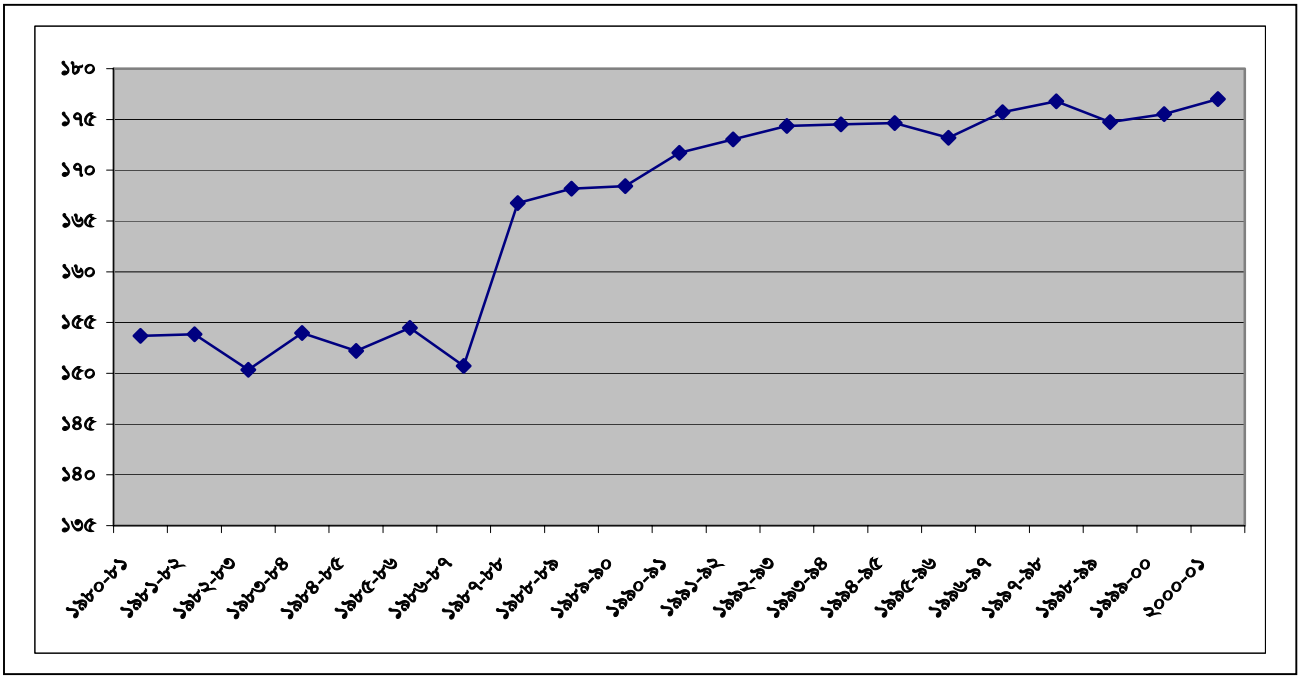

লেখচিত্র ৭.৪: ২০০০-০১ সালের তথ্যের ভিত্তিতে নীট ফসল বিভাজন এলাকা
(নীট এলাকা দেখানো হল = ৮.০৮ মিলিয়ন হেক্টর)

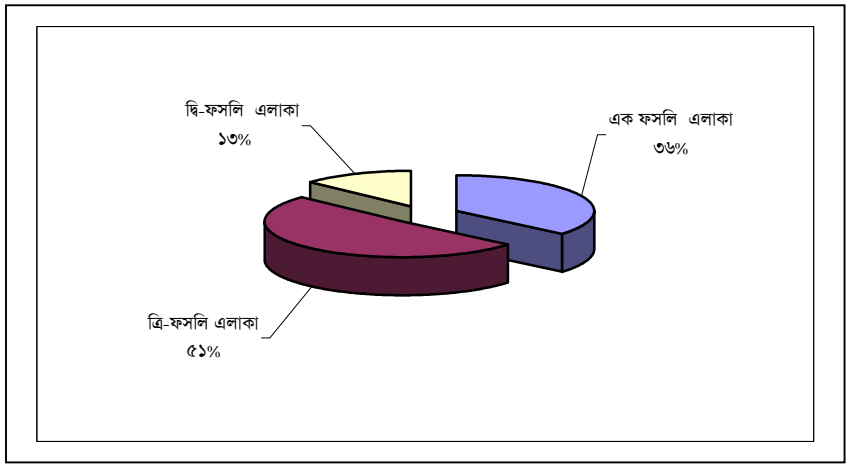

বন্যায় খাদ্য-শস্যের ক্ষয়ক্ষতিঃ

বন্যা প্রতি বছরই ফসলের ক্ষয়ক্ষতির একটি নিয়মিত কারণ। গত ২০০০ সালে বন্যায় দেশের ১৬টি জেলার ১১৫ টি উপজেলার মধ্যে ৯২ টি উপজেলার ১.৮৪ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল বিনষ্ট হয়। উৎপাদন আকারে এ ক্ষতির পরিমাণ ৫.২৮ লক্ষ মেঃ টন, যার মধ্যে ২.৯২ লক্ষ মেঃ টন চাল। গত ২০০১ সালে সংঘঠিত বন্যায় দেশের ১৬টি জেলায় ১৩১ টি উপজেলার মধ্যে ৭৯ টি উপজেলার ০.৪১৮ লক্ষ হেক্টর জমির ০.৯৯ লক্ষ মেঃ টন ফসল বিনষ্ট হয়। এর মধ্যে ০.৫৮ মেঃ টন চাল। ২০০২ সালে সংঘঠিত বন্যায় দেশের ৪৫টি জেলায় ২০৮ টি উপজেলায় ৩.৮৫ লক্ষ হেক্টর জমির ৮.৫২ লক্ষ মেঃ টন ফসল বিনষ্ট হয়। এর মধ্যে ৫.০৮

মেঃ টন চাল। ২০০৩ সালে সংঘটিত বন্যায় দেশের ৪৭ টি জেলায় ২৬৬ টি উপজেলায় ২.৪৫ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল বিনষ্ট হয়, এর মধ্যে ২.২৪ লক্ষ মেঃ টন চাল (সারণী-৭.৫)। এ বছর সম্প্রতি আগাম বন্যায় (early flush flood) সিলেটের হাওর অঞ্চলে ব্যাপক পরিমাণ বোরো ফসলের ক্ষতি হয়েছে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তা করার লক্ষে সরকার বন্যা-পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০০২ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের ফসলের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে সরকার ৭.১১৩ কোটি টাকা মঞ্জুর করে এবং এ অর্থের দ্বারা পুনর্বাসন কর্মসূচির মাধ্যমে যথাসময়ে উপকরণাদি ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

২০০৩ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ফসল আবাদে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মোট ৮৯৯.৯০ লক্ষ টাকা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য নাবীতে রোপণ উপযোগী রোপা আমন ধানের চারা উৎপাদন বাবদ ১৮.৬০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

সারণি -৭.৫ ঃ বন্যায় খাদ্য-শস্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

(২০০১ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত)

(ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমির পরিমাণ লক্ষ হেক্টর, উৎপাদনে ক্ষতির পরিমাণ লক্ষ মেঃ টন, টাকায় ক্ষতির পরিমাণ কোটি টাকা)

	২০০১			২০০২			২০০৩		
ফসলের নাম	জমির পরিমাণ	উৎপাদনে ক্ষতি	টাকায় ক্ষতি	জমির পরিমাণ	উৎপাদনে ক্ষতি	টাকায় ক্ষতি	জমির পরিমাণ	উৎপাদনে ক্ষতি	টাকায় ক্ষতি
আউশ	০.১০	০.১৫	২০.৪৯	০.৪১	০.৬০	৯৬.০৮	০.৭১৭৩১	০.১০৪০২	১৪৫.৬১৬৮
আউশ বীজতলা	০.০০২	০	০.৪০	০	০	০	০	০	০
বোনা আমন	০.০৪৭	০.০৫	৭.০৫	০.৬২	০.৬৯	৯৬.০৮	০.৯৯৬৬৬	০.৯৯৬৬৬	১৩৯.৫৪২২
রোপা আমন	০.১৮৪	০.৩৮	৫২.৪৭	০.৭৭	০	৭৪.৪৬	০.০৪৩৫১	০.০৯৫৭৪	১৪.০২৪৮
রোপা আমন বীজতলা	০	০	০	০.২১	০	৩৭.০৪	০.০৮৭৯৫	০	১৫.৮৩১০
বোরো	০	০	০	১.২৪	৩.৭৯	৫৩০.৪১	০.২৭৭৪৪	১.০৪১৪৪	১৪৫.৮০১৬
বোরো বীজতলা	০	০	০	০	০	০	০.০১৫৫১	০	২.৭৯১৮
মোট ধান (চাল)	**০.৩৩৩**	**০.৫৮**	**৮০.৪১**	**৩.২৫**	**৫.০৮**	**৮২১.৪৩**	**২.১৩৮৩৮**	**২.২৩৭৮৬**	**৪৬৩.৬০৮২**
পাট,শাকসব্জি,গাছ-গাছড়া প্রভৃতি	০.০৮৫	০.৪১	৩৯.৪৩	০.৬০	৩.৪৪	৩২৬.৮৬	০.৩০৯৪৬	১.১২৩৯৮	৪৩.৭৫৭৫
সর্বমোট	**০.৪১৮**	**০.৯৯**	**১১৯.৮৪**	**৩.৮৫**	**৮.৫২**	**১১৪৮.২৯**	**২.৪৪৭৮৪**	**৩.৩৬১৮৪**	**৫০৭.৩৬৫৭**

Drm t K…wl m¤c³mviY Awa`ßi, K…wl gš Yvjq|

খাদ্য বাজেট

২০০৩-০৪ অর্থবছরে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২৮১.২ লক্ষ মেট্রিক টন নির্ধারণ করা হয় যা নীট খাদ্যশস্য উৎপাদন হিসেবে দাঁড়ায় ২৫৩.০৮ লক্ষ মেট্রিক টনে (বীজ, পশুখাদ্য ও অপচয় বাবদ ১০% বাদ দিয়ে)। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের Food Planning & Monitoring Unit (FPMU) প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে দেশের খাদ্য চাহিদা ২২৬.৮২ লক্ষ মেট্রিক টন প্রাক্কলন করা হয়। ২০০২-০৩ অর্থবছরে সরকারি অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৯.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৮.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন)। চলতি ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৮.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৭.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ০.২০ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। খাদ্য সাহায্য হিসাবে ২০০২-০৩ অর্থ বছরে ২.৫৪ লক্ষ পরিমাণ ছিল ২৯.৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন। চলতি অর্থবছরের ২২-০৫-২০০৪ পর্যন্ত বেসরকারি

খাতে খাদ্যশস্যের আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২.৮৯১ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৭.৮৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১৫.০০৭ লক্ষ মেট্রিক টন)। ১৯৮০-৮১ হতে ২০০৩-০৪ পর্যন্ত বিদেশ হতে খাদ্যশস্য আমদানির হিসাব পরিশিষ্ট সারণি ২৮ -এ দেখানো হয়েছে।

কৃষি ব্যবস্থাপনা

অর্থনীতির মূলভিত্তি কৃষির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য কৃষি খাতের উন্নয়নের বিকল্প নাই। কৃষির অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্হান বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এ কারণে কৃষি খাতের উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সার্বিক অর্থনীতির সূচক বৃদ্ধিতে কৃষির এই গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। দেশে বর্তমানে ক্রমবর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পুরণ এবং সেই সাথে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার ও টেকসই করার লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক কৃষি ব্যবস্হার উপর বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে দেশের সর্বত্র মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের দোরগোড়ায় সারসহ কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ, কৃষি সম্প্রসারণ নীতির বাস্তবায়ন, কৃষিঋণ বিতরণ পদ্ধতি সহজিকরণ, কৃষিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি, কৃষিজাত পণ্যের মান উন্নয়নের জন্য গবেষণা পদ্ধতির আধুনিকায়ন, গবেষণালব্ধ সমন্বিত প্রযুক্তি ব্যবহার ও সম্প্রসারণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ।

জাতীয় কৃষি নীতির আলোকে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নমুলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জাতীয় কৃষিনীতিসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ণ করা হয়েছে। এই কর্ম-পরিকল্পনা জাতীয় কৃষিনীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও কৃষি প্রবৃদ্ধির কাম্য হার দ্রুত অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের পাশাপাশি টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্হা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। সম্প্রসারণ সেবাকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছানো, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, কৃষি পণ্য ব্যবসাকে শক্তিশালী, জনপ্রিয় ও লাভজনক করার কাজে বৈদেশিক সহায়তা গ্রহণ, এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগী কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপক সংস্কারমূলক উদ্যোগ গ্রহণ এর অন্যতম উদ্দেশ্য । জাতীয় কৃষি গবেষণা ব্যবস্হাকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকরভাবে গড়ে তোলার ব্যবস্হা নেয়া হয়েছে এবং সে সাথে গবেষণা ও সম্প্রসারণের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধির উপরও গুরূত্ব আরোপ করা হচেছ । এ ছাড়া মৃত্তিকা সম্পদের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় রোধ, সেচের পানির উপযোগিতা নির্ণয়, ভূমির অপব্যবহার ও ফসলের পুষ্টি ঘাটতি রোধকল্পে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমস্যা সমাধানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

কৃষকদের সার পরিস্হিতি নিয়মিতভাবে মনিটরিং ও সময়মত ব্যবস্হা গ্রহণের ফলে দেশে সার সরবরাহ এবং বিতরণের ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটেছে। সার বিতরণ পরিস্হিতির উন্নতিকল্পে গৃহীত ব্যবস্হাদির মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে মনিটরিং ব্যবস্হা প্রতিষ্ঠা, ডিলারশীপ ব্যবস্হা উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ, সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের জন্য বাফার মজুদ কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মনিটরিং ব্যবস্হা জোরদারকরণ, উন্নতমানের সার হিসেবে ডিএপি/ এনপিকেএস সার ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ, রোপা ধানে গুটি ইউরিয়া সার ব্যবহার ও সম্প্রসারণ, দানাদার ও রং মিশ্রিত এসএসপি সার আমদানি নিষিদ্ধকরণ, পুষ্টিমান সম্পন্ন ফসফেটিক সার আমদানি উৎসাহিত করার জন্য টিএসপিডি, এপি, এমওপি এবং এনপিকেএস সার আমদানির উপর হতে আগাম আয়কর ও উন্নয়নসারচার্জ মওকুফের ব্যবস্হা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সার বিতরণের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে না।

মাটির গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা গবেষণাগারের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মাঠ পর্যায়ে মাটি পরীক্ষার ব্যবস্হা করা হয়েছে। মাটির উর্বরা শক্তি বজায় রাখার জন্য শস্য বহুমুখিকরণ কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। কৃষি বাজার ব্যবস্হার উন্নয়ন ও কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে ১৯টি পাইকারি বাজারের উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে। উন্নতমানের বীজ অধিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত, এটি বিবেচনায় রেখে বিএডিসির মাধ্যমে মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে; এ লক্ষ্যে বিএডিসির বীজ সংক্রান্ত কার্যক্রমকে জোরদার করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক চাষী পর্যায়ে বীজ নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট, পারমাণবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাতসহ বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন করে কৃষি ক্ষেত্র ও খাদ্যশস্য উৎপাদনে দেশকে সমৃদ্ধ করার কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হলেও জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির আরোও সম্ভাবনা রয়েছে। সে সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য এর সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে।

কৃষিখাতে ভর্তুকি

কৃষি খাতে বিনিয়োগের স্বল্পতা ও কৃষি উপকরনের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষিকে টিকিয়ে রাখার জন্য কৃষিতে ব্যাপক পরিমাণ ভর্তুকি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এছাড়া আন্তর্জাতিক অংগনে উন্নত দেশসমূহের এ বিষয়ে দুমুখী নীতির ফলে কৃষিখাতে ভর্তুকির বিষয়টি এখন সর্বত্রই আলোচিত হচ্ছে। বিশেষ করে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) দোহা সম্মেলনের পর থেকে এ আলোচনা জোরদার হয়ে আসছিল যা কানকুন সম্মেলন তুঙ্গে উঠেছে। এ ভতুর্কির পরিমান ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি করার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। বর্তমানে কৃষিপণ্য রপ্তানিতে ২৫ শতাংশ নগদ বিকল্প সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এ সব উদ্যোগ কৃষি খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেককেই উৎসাহিত করেছে।

সেচ

দেশে কৃষি উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সেচের পানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সরকারিভাবে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহ (শক্তিচালিত পাম্প, গভীর নলকুপ, অগভীর নলকূপ, ভাসমান পাম্প ইত্যাদি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করার পর দ্রুত সেচের অধীনে জমির পরিমাণ অর্থাৎ সেচকৃত এলাকা বাড়তে থাকে। অবশ্য সেচযন্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে আনুপাতিক হারে সেচকৃত এলাকার পরিমাণ বাড়ছে না। বিভিন্নভাবে সেচের পানির অপচয় হচ্ছে, ফলে মাঠ পর্যায়ে কৃষি উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য এ মূল্যবান উপকরণটি কার্যকর ও দক্ষভাবে ব্যবহৃত হচেছ না। সঠিকভাবে সেচের পানির ব্যবস্হাপনার মাধ্যমে পানির অপচয় হ্রাসের পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জ্বালানি খরচও হ্রাস করা সম্ভব। এ পরিস্হিতি বিবেচনা করে ফসলনীতির আওতায় সেচ ও খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্হাপনাকে মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ভূ-গর্ভস্হ ও ভূ-উপরিস্হ পানির সুসমন্বিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করে ফসল উৎপাদনে নিবিড়তা, বহুমুখিকরণ ও ফলন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সেচের উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচেছ। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো হচেছঃ (১) ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্প; (২) সীতাকুন্ড উপজেলাধীন কুমিরা-সোনাইছড়ি এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ ও নিষ্কাশন ব্যবস্হা উন্নয়ন এবং গুপ্তাখালি জলাধার নির্মাণ ও সেচ প্রকল্প; (৩) সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বরেন্দ্র এলাকা); (৪) বরেন্দ্র এলাকায় গভীর নলকুপ স্হাপন প্রকল্প; (৫) আশুগঞ্জ পলাশ এগ্রো ইরিগেশান প্রকল্প ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সার্বিকভাবে এ প্রকল্পগুলোর উদ্দেশ্য হলো সেচ ব্যবস্হার উন্নয়ন, ভূ-উপরিস্হ পানির যথাযথ ব্যবহার; সমন্বিত এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও খরাপ্রবণ এলাকায় সেচ সুবিধাদি সম্প্রসারণ। উপরন্ত, ক্ষুদ্র সেচ সুবিধার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিএডিসির ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রমকে জোরদার করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

জাতীয় ক্ষুদ্র সেচ শুমারির ফলাফল মোতাবেক গত ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে সেচকৃত জমির পরিমাণ ছিল ৪৫.০৬ লক্ষ হেক্টর (সারণি-৭.৬)। ২০০০-২০০১ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন এলাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৫.১৬ লক্ষ হেক্টর, ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ৪৮.০৪ লক্ষ হেক্টর এবং ২০০২-০৩ অর্থবছরে ৪৮.১৪ লক্ষ হেক্টর । লক্ষ্য করা যায় যে, এ বছরে সার্বিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৩.০২ ভাগ।

সারণি-৭.৬ঃ সেচকৃত জমির পরিমাণ

(হেক্টর)

সেচ পদ্ধতি	১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪ (প্রাক্কলিত)
ক) ভূ-উপরিস্থ ঃ					
মেজর ইরিগেশন*	৪২২৬৫৬	৩৫২০০০	৪৬৯৫৭৫	৪৮৫০০০	৪৯৫০০০
এল এল পি	৬৪৫০৫৩	৬৪৭৩০০	৭৬১৪৩৯	৭৬৪৩০০	৭৬৪৩০০
দেশীয় পদ্ধতি	২২৪১৭২	২২২০০০	১৮২২৪০	১৭৬২৮০	১৭৬২৮০
ক) উপ-মোট	১২৯১৮৮১	১২২১৩০০	১৪১৩২৫৪	১৪২৫৫৮০	১৪৩৫৫৮০
খ) ভূ-গর্ভস্থ				৫৭৮১৩২	
ডিটিডব্লিউ	৫১৭৫৪৮	৫১৯৭৫০	৫৭৬০৪৩	২৫৫২১৪০	৫৭৮১৩২
এস টি ডব্লিউ	২৪৬১২৩৮	২৪৮৮৪৩৫	২৫৪৭৩০৩	৫৮১২২	২৫৫২১৪০
এইচ, টি ডব্লিউ**	৪৬৯০২	৮৬৯০৬	৬২৫১৮	৫৫৬০	৫৮১২২
এফএমটি ডব্লিউ	৪৫১৮	৪৫৮০	৫৫৫৬	১০৬২৭৮	৫৫৬০
ডিএস এস টি ডব্লিউ	১০৬৬০৮	১০৬৫৭১	১০৫৫৮৫	৯৮১৪০	১০৬২৭৮
ভিডিএসএসটি ডব্লিউ	৭৭৬২৮	৭৮৯৩৮	৯৪২১০		৯৮১৪০
খ) উপ-মোট	৩২১৪৪৪২	৩২৮৫১৮০	৩৩৯১২১৫	৩৩৯৮৩৭২	৩৩৯৮৩৭২
গ) অন্যান্য ক্ষুদ্র সেচ	-	-	-	-	-
মোট সেচ (ক+খ+গ)	৪৫০৬৩২৩	৪৫১৬৪৮০	৪৮০৪৪৬৯	৪৮১৩৯৫২	৪৮২৩৯৫২

উৎস ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়

* বাপাউবো এর আওতাধীন প্রাক্কলিত সেচকৃত এলাকা।

** ট্রেডল পাম্প, রোয়াল পাম্প ইত্যাদি আন মেকানাইজড ইউনিটসহ।

সার

দেশে ক্রমাগত সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯২-৯৩ সালে মোট সার ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ২৩.১৬ লক্ষ মেঃ টন, ২০০২-০৩ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩২.৯৮ লক্ষ মেট্রিক টনে। এককভাবে ইউরিয়া সার ১৯৯২-৯৩ সালে ব্যবহার হয় ১৫.৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন, ২০০২-০৩ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২২.৩৯ লক্ষ মে. টনে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯২-৯৩ সালের তুলনায় ২০০২-০৩ সালে ইউরিয়া ব্যবহার ৪৫ শতাংশ অর্থাৎ ৬৯১.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন বেশী হয়েছে। সেচ এলাকা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ইউরিয়া প্রয়োগ সম্প্রসারণের কারণে ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরপক্ষে ফসফেটিক সারের (টিএসপি, ডিএপি, এনপিকেএস ও এসএসপি) ব্যবহার ১৯৯২-৯৩ সালের তুলনায় ২০০২-০৩ সালে ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে সারের ব্যবহার ১৯৯২-৯৩ সালের তুলনায় ৪১.৫৮ শতাংশ বেড়েছে (সারণি ঃ ৭.৭)।

কৃষি মন্ত্রণালয় মার্কেট মনিটরিং এন্ড ইনফরমেশন সিষ্টেম (এমএমআইএস) এর মাধ্যমে সার্বিক সার পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং পরিবীক্ষণ করছে। জেলা ও মাসওয়ারি চাহিদা মোতাবেক ইউরিয়া সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট জেলা/ উপজেলা কমান্ড এরিয়ার বাইরে পরিবহনের ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ আছে, তবে গুটি ইউরিয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা-নিষেধ নেই। জেলা পর্যায়ে গঠিত জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি কর্তৃক সরবরাহ, মজুদ, প্রাপ্যতা, মূল্য এবং সার ডিলারের কার্যক্রম মনিটরিং, ডিলারশীপ উপজেলা ভিত্তিককরণ এবং কেন্দ্রীয়ভাবে সার বিতরণ জাতীয় সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলায় সার বিতরণ আরো সুষম, মূল্য পরিস্হিতি কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে সীমিত এবং চোরাচালান/কালোবাজারী নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পিকসিজনে যাতে দুস্প্রাপ্যতার দরুন বা কৃত্রিম কোন সংকট না হয় সে লক্ষ্যে বিসিআইসির মাধ্যমে ইউরিয়া সারের বাফার মজুদ রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ইউরিয়া সারের অপচয় হ্রাস, ৩০-৩৫ শতাংশ সাশ্রয়, ২০-২৫ শতাংশ ফলন বৃদ্ধি এবং গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকল্পে বেসরকারি খাতে ১৯৯৫-৯৬ সাল হতে প্রবর্তিত গুটি/মেগা গুটি ইউরিয়া সার (সুপার/ মেগা গ্রেনুলস) তৈরি ও বাজারজাতকরণ করা হচেছ। গুটি ইউরিয়া তৈরির মেশিনের সংখ্যা ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ১০৪৯ টিতে (১০২৪টি সুপার ও ২৫টি মেগা) পৌঁছেছে। গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের আওতাভুক্ত জেলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪ টিতে পৌঁছেছে। ২০০৩-০৪ সালে ৭.৩০ লক্ষ হেক্টর রোপা ধানের জমিতে (আমন ৮১২৫০ হেক্টর, বোরো ৬৩১২৫০ হেক্টর এবং আউশ ৩৭,০০০ হেক্টর) গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের পরিকল্পনা আছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নার্থে আমন, বোনা আউশ মৌসুমে ১.২৫ লক্ষ মে.টন ইউরিয়া সার বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হচেছ । বর্তমানে ধান ছাড়া অন্যান্য রবি শস্যেও গুটি ইউরিয়া ব্যবহার শুরু হয়েছে। সার ব্যবহার সুষম করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার মিশ্র সারের ব্যবহার উৎসাহিত করা হচেছ । স্থানীয়ভাবে বিসিআইসির চট্টগ্রামস্থ টিএসপি কমপ্লেক্সে পরীক্ষামূলক কিছু এনপিকেএস উৎপাদন হচেছ এবং বেসরকারি খাতে নর্দার্ন এগ্রো-সার্ভিস লিঃ, দিনাজপুর এবং আফতাব ফার্টিলাইজারস এন্ড কেমিক্যালস লিঃ নারায়ণগঞ্জ এনপিকেএস উৎপাদন ও বাজারজাত করছে। এনপিকেএস সার বেসরকারি খাতেও আমদানি হচেছ।

এসএসপি সারের পরিবর্তে অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন ডিএপি, টিএসপি, এনপিকেএস ও পটাশ সারের আমদানি বৃদ্ধি ও এ সকল সার ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের প্রচেষ্টা নে'য়া হয়েছে। ভেজাল/নকল/নিম্নমানের সার উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণ নিয়ন্ত্রণ করাসহ সারের গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখার জন্য সার (নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ১৯৯৯ অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে । বেসরকারি খাতে আমদানিকৃত সারের ক্ষেত্রে পোষ্ট ল্যান্ডিং ইন্সপেকশন কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। তাছাড়া একটি সার পরিদর্শন ম্যানুয়েল এবং একটি ম্যানুয়েল ফর ফার্টিলাইজার এনালিসিস প্রণীত হয়েছে।

সারণি -৭.৭ ঃ রাসায়নিক সারের ব্যবহার

'০০০' মেট্রিক টন

ব্যবহৃত সার	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	99/2000	2000/01	01/02	02-03
ইউরিয়া	1547.4	1579.0	1748.5	2045.5	2141.0	1867.0	1902.0	2151.0	2121.0	2247.42	2239.00
টিএসপি	407.0	234.2	122.9	111.1	72.6	62.4	170.25	259.3	399.5	425.31	405.00
ডিএপি	2.0	28.7	1.8	0	0	6.8	38.63	109.2	90.1	127.03	112.00
এমপি	126.1	103.9	154.2	155.9	219.3	193.5	210.75	239.5	124.0	222.26	250.00
এসএসপি	119.8	170.6	533.5	596.9	525.3	473.3	362.37	237.2	138.6	127.13	130.00
এনপিকেএস	0	0	0	0	0	0	0	0	10.2	12.87	30.00
এএস	5.0	10.0	2.5	8.7	11.7	9.7	12.42	26.0	13.0	20.19	10.00
জিংক	0.7	5.2	0	1.0	1.2	0.7	0.3	1.2	3.0	0.24	2.00
জিপসাম	108.2	86.1	77.2	103.6	86.6	113.4	128.22	189.4	102.3	96.05	120.00
অন্যান্য	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
মোট	2316.2	2217.8	2640.6	3022.7	3057.7	2726.8	2824.9	3212.9	3017.5	3278.50	3298.00

উৎস ঃ এমএমআইএস, কৃষি মন্ত্রণালয়।

কৃষি ঋণ

বাংলাদেশের কৃষি ভরণপোষণ পর্যায়ে (subsistence level) পরিচালিত হচেছ বিধায় উপকরণ হিসাবে কৃষি ঋণ একটি ভিন্নমাত্রার গুরুত্ব বহন করে। সরকার এ বছর ৫০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের সুদ মওকুফের ঘোষণা করেছে, যা কৃষকদের ঋণ ভার লাঘব করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সুদূরপ্রসারী অবদান রাখবে। এর ফলে ১৫ লক্ষ কৃষক ৫০০ কোটি টাকা সুদ পরিশোধের দায় থেকে মুক্তি পাবে। ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরে কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৮৪১.৮৫ কোটি টাকা। কিন্তু ২০০২-০৩ অর্থ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩২৭৮.৩৭ কোটি টাকায়। বর্তমান ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে (মার্চ'০৪ পর্যন্ত) ২৪৪৯.৪৪ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। গত ১৯৯২-৯৩ হতে ২০০৩-০৪ পর্যন্ত কৃষি ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৭.৮ এ দেখানো হলোঃ

সারণি-৭.৮ঃ কৃষি ঋণের বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা, বিতরণ, আদায় ও স্থিতি

(কোটি টাকা)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা	ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
১৯৯২-৯৩	১৪৭৪.৪১	৮৪১.৮৫	৮৬৯.২৩	৫৬৯২.৮৪
১৯৯৩-৯৪	১৬৪৩.০৮	১১০০.৭৯	৯৭৯.১২	৬২২২.০০
১৯৯৪-৯৫	২১৬১.৭২	১৬০৫.৪৪	১১২৪.১১	৭০৪৫.২২
১৯৯৫-৯৬	২৪৩৪.২৭	১৬৩৫.৮১	১৩৪০.০২	৭৭৬৯.০৭
১৯৯৬-৯৭	২৩৯৪.২২	১৬৭২.৪৩	১৬৪৬.৩৮	৮২৫৬.০০
১৯৯৭-৯৮	২৫২৫.৮৩	১৮১৪.৫৩	১৭৭৯.২৯	৮৫১৫.০৪
১৯৯৮-৯৯	৩২৭০.০১	৩২৪৫.৩৬	২০৩৯.৬৫	৯৭০২.৫১
১৯৯৯-২০০০	৩৩৩১.০০	২৮৫১.২৯	২৯৯৬.২৯	১০৬৪৮.৯০
২০০০-০১	৩২৬৫.৯২	৩০১৯.৬৭	২৮৭৭.৮৭	১১১৩৭.২৬
২০০১-০২	৩৩২৬.৬৪	২৯৫৪.৯১	৩২৫০.২৭	১১৩৫৫.৫৮
২০০২-০৩	৩৫৬০.৫৩	৩২৭৮.৩৭	৩৫১৬.৩১	১১৯১৩.৩৫
২০০৩-০৪*	৪৩৮৮.৯৪	২৪৪৯.৪৪	২১৮১.০৩	১১২১১.২৯

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * মার্চ, ২০০৪ পর্যন্ত।

কৃষিখাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

২০০০২-২০০৩ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট বরাদ্দ প্রদান করা হয় ৪২৪.৫২ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি (জিওবি) বরাদ্দ ২৮৩.৩৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৪১.১৪ কোটি টাকা । জুন'০৩ পর্যন্ত সময়ে মোট ৩৬৮.৬৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৮৭ শতাংশ।

চলতি ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ৭৬টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাাদ্দ রয়েছে ৫৪৫.৬৯ কোটি টাকা, যার মধ্যে জিওবি খাতে ৩২৩.১৯ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৫৯ শতাংশ) এবং প্রকল্প সাহায্য ২২২.৫০ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৪১ শতাংশ)। ফেব্রুয়ারি'০৪ পর্যন্ত জিওবি খাতে ছাড়কৃত ১৯০.৫০ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৫৯.৪২ কোটি টাকা (যা মোট ছাড়ের ৮৪ শতাংশ)। প্রকল্প সাহায্য খাতের ব্যয় ৮০.৯৫ কোটি টাকাসহ মোট ব্যয় হয়েছে ২৪০.৩৭ কোটি টাকা।

মৎস্য সম্পদ

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। দেশে আমিষের চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মৎস্য খাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। দেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪৪.৪ লক্ষ হেক্টর। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর যা মোট জলাশয়ের প্রায় ৯১.১ শতাংশ। বাকী প্রায় ৮.৮ শতাংশ বদ্ধ জলাশয়। ২০০২-০৩ অর্থবছরের দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ২০.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় ও সামুদ্রিক জলাশয় হতে যথাক্রমে ৭.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন, ১৫.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৪.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদিত হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ আসে মাছ থেকে। বর্তমানে দৈনিক মাথাপিছু মাছ সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ২৮ গ্রাম, যেখানে প্রয়োজন কমপক্ষে ৩৫ গ্রাম। জাতীয় আয়ের প্রায় ৫.৩ শতাংশ এবং দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৬ শতাংশ আসে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি থেকে। ২০০১-০২ অর্থবছরে ৪১,৪৮২ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ১৬৩৭.৭৫ কোটি টাকা আয় হয়েছে। ২০০২-০৩ অর্থবছরে ৪৭,৩৭১ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ১৯৪১.৫৯ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে পোনা উৎপাদন ও মাছ চাষের উন্নত প্রযুক্তি বেসরকারি পর্যায়ে হস্তান্তরের ফলে দীঘি-পুকুর তথা বদ্ধ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। মূলতঃ দেশে এখন ব্যক্তিমালিকানাধীন খামার ও হ্যাচারি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে মোট বদ্ধ জলাশয়ের পরিমাণ ৪১২৩৪১ হেক্টর। তন্মধ্যে ২৬৫৫০০ হেক্টর পুকুর, ৫৪৮৮ হেক্টর বাওড় এবং ১৪১৩৫৩ হেক্টর চিংড়ি খামার। কৃত্রিম উপায়ে পোনা উৎপাদন ও মাছ চাষের উন্নত প্রযুক্তি বেসরকারি পর্যায়ে হস্তান্তরের ফলশ্রুতিতে দীঘি পুকুর তথা বদ্ধ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষে হেক্টর প্রতি বছরে ২.৫ টন মাছ এবং মাছ-চিংড়ির মিশ্র চাষে হেক্টর প্রতি বছরে ৫০০ কেজি চিংড়ি উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ ব্যাপক প্রসার লাভ করছে। চিংড়ির উৎপাদন ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের ৬৮,৩৪৯ মেট্রিক টন থেকে ২০০২-০৩ অর্থবছরে ১,০৩,৪৬১ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলাশয়ের মোট আয়তন ১,৬৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এই জলাশয় থেকে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ২২ শতাংশ আসে। চিংড়ির চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ, হ্যাচারি স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চিংড়ি আহরণের পর চিংড়ির গুণগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে ২০টি চিংড়ি অবতরণ কেন্দ্র ও সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে । ২০০৩ সালের হিসাব অনুযায়ী সরকারি পর্যায়ে ১১২টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ৬৭১টিসহ সর্বমোট ৭৮৩টি মৎস্য হ্যাচারি ও খামার রয়েছে। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় ১,৭০০টি মৎস্য খামার আছে। বেসরকারি খামার ও হ্যাচারি হতে ২০০৩ সালে ৫১৭ কোটি পোনা (২৭৪.৮৮ মেঃ টন রেণু) উৎপাদিত হয়েছে এবং প্রাকৃতিক উৎস থেকে একই সময়ে প্রাপ্ত রেণু পোনার পরিমাণ প্রায় ১৯৭৫ কেজি।

২০০২-০৩ অর্থবছরে এডিপিতে মাধ্যমে ১৬টি বিনিয়োগ ও ৫টি কারিগরি প্রকল্পের সংস্থান রাখা হয়েছে। এ ২১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ১২৯.৫৪ কোটি টাকা (৪৮.৯৬ কোটি টাকা স্থানীয় মুদ্রা এবং ৮০.৫৮ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য) বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে ফেব্রুয়ারি'০৪ পর্যন্ত মোট ৫৮.১৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ প্রায় ৪৫ অংশ অগ্রগতি হয়েছে।
১৯৯৬-৯৭ অর্থবছর হতে ২০০৩-০৪ অর্থবছর পর্যন্ত মৎস্য উৎপাদনের বিবরণ সারণি ৭.৯ -এ দেয়া হ'ল।

সারণি ৭.৯ঃ মাছের উৎপাদন

(১৯৯৬-৯৭ - ২০০৩-০৪)

(j¶ †gwUªK Ub)

জলাশয়ের বিবরণ	আয়তন (লক্ষ হেঃ)	৯৬-৯৭	৯৭-৯৮	৯৮-৯৯	৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪ (প্রজেকটিভ)
১. অভ্যন্তরীণ জলাশয়ঃ									
(ক) মুক্ত জলাশয়									
নদী ও নদী মোহনা	১০.৩২	১.৬০	১.৫৭	১.৫১	১.৫৪	১.৫০	১.৪৪	১.৫২	১৬.১৫
সুন্দর বন	-	.০৯	.০৭	০.১১	০.১১	০.১২	০.১২	০.১৩	০.১৪
বিল	১.১৪	.৬৩	.৬৮	০.৭০	০.৭৩	০.৭৫	০.৭৬	০.৮১	০.৮৬
কাপ্তাই লেক	.৬৯	.০৬	.০৬	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৮	০.০৮
প্লাবন ভূমি	২৮.৩৩	৩.৬২	৩.৭৮	৪.১০	৪.২৫	৪.৪৫	৪.৫০	৪.৭৬	৫.০৫
মোট মুক্ত জলাশয়	**৪০.৪৭**	**৬.০০**	**৬.১৬**	**৬.৪৯**	**৬.৭০**	**৬.৮৯**	**৬.৮৯**	**৭.৩০**	**৭.৭৪**
(খ) বদ্ধ জলাশয়									
পুকুর	২.৪২	৪.০৪	৪.৮৩	৫.০০	৫.৬১	৬.১৬	৬.৮৫	৭.২৬	৭.৭১
বাওড়	.০৫	.০৩	.০৩	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৪
চিংড়ি খামার	১.৪১	.৭৯	.৮৮	০.৯০	০.৯২	০.৯৩	১.০০	১.০৩	১.১০
মোট বদ্ধ জলাশয়	**৩.৮৮**	**৪.৮৬**	**৫.৭৫**	**৫.৯৪**	**৬.৫৭**	**৭.১৩**	**৭.৮৭**	**৮.৩৪**	**৮.৮৫**
মোট অভ্যন্তরীণ	**৪৪.৩৬**	**১০.৮৬**	**১১.৯১**	**১২.৪৩**	**১৩.২৮**	**১৪.০২**	**১৪.৭৫**	**১৫.৬৪**	**১৬.৫৯**
২. **লামুদ্রিক জলাশয়ঃ**									
ক) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে	.৪৮	.১৪	.১৫	০.১৬	০.১৬	০.২৪	০.৩০	০.২৭	০.২৮
খ) আর্টিসনাল ভিত্তিতে	ব.ন.ম	২.৬১	২.৫৮	২.৯৪	৩.১৮	৩.৫৫	৩.৯০	৪.১৪	৪.৩৯
মোট সামুদ্রিক		**২.৭৫**	**২.৭৩**	**৩.১০**	**৩.৩৪**	**৩.৭৯**	**৪.০০**	**৪.৪০**	**৪.৬৭**
দেশের মোট মৎস্য উৎপাদন		**১৩.৬০**	**১৪.৬৪**	**১৫.৫২**	**১৬.৬১**	**১৭.৮১**	**১৮.৯০**	**২০.০৪**	**২১.২৬**

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।

পশু সম্পদ

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে পশু সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য নিরসনে পশুসম্পদ খাত বর্তমানে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচিত। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পশুজাত দ্রব্য, যেমন- চামড়া, পশম ও হাড় ইত্যাদির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ২০০২-০৩ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদে (জিডিপি) এ খাতের অবদান ২.৯৩ শতাংশ যা কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে ১৭ শতাংশ। এ উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ৪.৫১ শতাংশ। যান্ত্রিক চাষাবাদের পাশাপাশি দেশের শতকরা ৯৫ ভাগ ভূমিকর্ষণ কায়িকভাবে করা হয়ে থাকে। দেশে শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ জনগোষ্ঠী সরাসরি ও শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ আংশিকভাবে পশু সম্পদের উপর নির্ভরশীল। বেসরকারিখাত ও এনজিওসমূহকে সম্পক্ত করার ফলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এ খাত পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায় ১৯৯১-৯২ অর্থছরে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪.১৯ কোটি ও ১১.০৫ কোটি। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮.১৭ কোটি ও ১৬.৩৫ কোটি। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে হাঁস-মুরগির মোট ডিমের উৎপাদন ছিল ৩ শত ৭৯ কোটি এবং ২০০২-০৩ অর্থবছরে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৪ শত ৭৭ কোটি। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে দুধ এবং মাংসের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১৩.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৪.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০০২-০৩ অর্থবছভে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৮.২ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৮.৩ লক্ষ মেট্রিক টন।

সরকার পশু সম্পদ উন্নয়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে ব্যাপক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন করছে। ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন- জাতীয় কর্মসূচিসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। স্ব-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর বাণিজিক খামার স্থাপন এ খাতে যেমন ব্যাপক অবদান রেখেছে তেমনি বেকার যুবদের আত্ম কর্ম সংস্থান ও বিরাট অংকের বিনিয়োগ আকর্ষণ করেছে। তবে সম্প্রতি থাইল্যান্ডসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে মুরগীর খামারে বার্ড ফ্লু সংক্রমণের খবর ছড়িয়ে পড়লে তা বাংলাদেশের খামারিদের উপর এক বিরাট ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলেছে।

২০০৩-০৪ অর্থবছরে পশুসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ১৫টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৮৯.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি'০৪ পর্যন্ত মোট ৩৪.১৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৩৮ শতাংশ।